বিগ ব্যাং
ও
মহাবিশ্বের আবির্ভাব

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

সবুজপত্র

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (M.Sc, Ph.D, C.Chem, F.R.S.C) ১৯৩৮ সালে পঞ্চগড়ের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ১৯৬৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি নরওয়ে যান এবং ১৯৭১ সালে অসলো ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন (Ph.D) এবং ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

১৯৭২ সালে তিনি পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ২০০৩ পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজে রত থাকেন। এরই মধ্যে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন। এখানেও তিনি চার বছর গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তার সহধর্মীনির নাম ফিরোজা বেগম। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক।

সূচনা

মানুষ হাজার প্রজন্ম ধরে রাতের আকাশে তাকিয়ে দেখছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজি এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করছে কিভাবে ওই আলোক বিন্দুগুলি সৃষ্টি হল, কত দূরেই বা তাদের অবস্থান, কিভাবেই বা আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবী আবির্ভূত হল? বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটার পর থেকেই মানুষ আড়াই হাজার বৎসর ধরে মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করছে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করছে, অধ্যয়ন করছে এবং তাদের পর্যবেক্ষণের সাথে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা মিলিয়ে দেখছে। তাদের পর্যবেক্ষণে এ পর্যন্ত ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জে ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। কত গ্রহ ওই নক্ষত্রগুলি প্রদক্ষিণ করছে তা অনিশ্চিত, তবে কেবল একটি গ্রহে জীব-বৈচিত্র্যের বিবর্তন ঘটেছে, আর তা হল এই পৃথিবী। পৃথিবীর মানুষ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে।

বিগত দুই সহস্রাধিক বৎসর ধরে মানুষ গভীর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরাই প্রথম এক প্রজন্ম যারা মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং বিবর্তন সম্পর্কে একটি শোভন, যৌক্তিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ বিবরণ দেওয়ার অধিকার দাবি করতে পারি। বিগ ব্যাং মডেল মহাবিশ্বের সবকিছু– যা আমরা আকাশে দেখতে পাই, তার সূচনার রুচিশীল ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা মানবীয় ধীশক্তির এক বিরাট বিজয়। ইহা চির-অতৃপ্ত ঔৎসুক্য, অবিশ্বাস্য অনুমান, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং নির্মল যুক্তি ও চিন্তার ফল।

আরও বিস্ময়কর যে বিগ ব্যাং মডেল সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিস্ময়াভিভূত হতে হয় এর সারল্য এবং সৌন্দর্য দেখে, এবং যেসব নীতি অবলম্বন করে তা প্রতিষ্ঠিত, তার সমগ্রই বলা যায় পদার্থবিজ্ঞানের, যার অধিকাংশই সেকেন্ডারী লেভেলে পড়া হয়ে থাকে।

বিগ ব্যাং মডেলের প্রারম্ভিক চাঞ্চল্যের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তত্ত্বের কিছু ভিত্তিমূল নিয়ে আলোচনা করা উচিত। মহাবিশ্বের বিগ ব্যাং মডেল বিগত শতকে উন্নতি লাভ করেছে। কারণ বিংশ শতাব্দীর সাফল্যগুলির ওপর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যা বিগত শতাব্দীসমূহে নির্মিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহাবিশ্বের তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণসমূহ এক বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিগত দুই সহস্রাধিক বৎসরকালে। আরও পশ্চাতে গেলে বৈষয়িক সত্য উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তখনই, যখন শক্তি (Myth) ও লোকগাঁথার ওপর আস্থায় ভাটা পড়ে, ফলে বিগ ব্যাং মডেলের মূলভিত্তি এবং মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আগ্রহ তখন থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে, যখন প্রাচীনকালের পৌরাণিক উপকথার ওপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ স্তিমিত হতে দেখা গেছে।

বিশ শতকের শুরুতে সৃষ্টি-তত্ত্ব ছিল অনুমান নির্ভর। তারপর পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যায় নতুন নতুন আবিষ্কার বিশ্ব-তত্ত্বকে বিজ্ঞানের এক প্রাণবন্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে। সমগ্র বিংশ শতাব্দীতে সৃষ্টি-তত্ত্ববিদরা এক বিশদ ধারণার উন্নয়ন করে যা মহাবিশ্বের সূচনা এবং বিবর্তনের বিবরণ দেয়।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব নয়। বিগ ব্যাং তত্ত্ব মহাবিশ্বের উৎস সম্পর্কে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না, তাহলেও তা সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যাখ্যা– কোথা থেকে এ মহাবিশ্বের আবির্ভাব ঘটেছে?

১৯৯৮ এর শুরুতে নভোপদার্থবিদদের দু'টি গ্রুপ এক চমকপ্রদ ঘোষণা দেয়। মহাবিশ্ব– যা সবসময়ে প্রসারিত হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি হ্রাস পাচ্ছে মনে করা হতো– প্রকৃতপক্ষে দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করছে। বিজ্ঞানীরা সুপারনোভা দেখছিল– যা এক বিস্ফোরোন্মুখ মুমূর্ষু নক্ষত্রের তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণা– এমন এক দূরত্বে যা কখনও কোন সময়ে দেখা যায়নি। এই দীপ্তিময় অগ্নিগোলকগুলি প্রস্তাব করে যে মহাশূন্য ক্রমাগত দ্রুত প্রশস্ত হচ্ছে, এবং সময়ের সাথে ত্বরিত (accelerated) হচ্ছে। এ তথ্য মহাবিশ্বের কর্ম-প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তোলে। মহাকর্ষ- যে শক্তি মহাবিশ্বের সবকিছুকে একত্র ধরে রাখার কথা এবং এক নিয়ন্ত্রণসাধ্য কাঠামোতে ধরে রাখার কথা– নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বরং এক রহস্যজনক শক্তি (energy) মহাকর্ষকে প্রতিরোধ করছে এবং ব্যর্থ করে দিয়ে মহাবিশ্ব প্রশস্ত হচ্ছে। প্রাপ্ত এ ফলাফল যদি সত্য হয়, তাহলে পদার্থবিদদের পুনঃপরীক্ষা করা উচিত কিভাবে তারা আইনস্টাইনের সাধারণ অপেক্ষবাদ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবে এবং কিভাবে এ মহাবিশ্ব বিগ ব্যাং এর মুহূর্ত থেকে বিবর্তিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দেবে।

বিজ্ঞানীসমাজ নতুন ফলাফলে হতবিহ্বল। নতুন উপাত্ত পুরাতন ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক, সুতরাং নতুন উপাত্তের আলোকে পুরাতন ধারণার সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টি-তত্ত্ববিদগণ মনে করে তাদের ধারণাগুলির কিছু পরিবর্তন করে নতুন উপাত্তের সাথে সংযোজন করলে বিগ ব্যাং তত্ত্বের আরও উন্নতি সাধন

হবে। কিন্তু রহস্যজনক, মহাকর্ষবিরোধী উপাদান সংযুক্ত করে তারা আর এক সমস্যার সম্মুখীন হয়-যা মহাবিশ্বে যথেষ্ট বস্তুর অভাব নির্দেশ করে– যা আরও বিস্ময়কর।

ঐতিহ্যগতভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব ধর্ম এবং দর্শনের সাথে জটিলভাবে জড়িত। কিভাবে এই বিশ্ব নিখিল সৃষ্টি হল? কেন সৃষ্টি হল? কিভাবে বিশ্ব নিখিল তার কর্ম প্রক্রিয়া সাধন করে? কত সুন্দর এই পৃথিবী, আমাদের এই সৌরজগত, এই মনাবসমাজ? এতসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একজনকে বিশ্বাস রাখতে হবে- ধর্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞান- জ্ঞানের এ তিন শাখায় যারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অদ্ভুত কাল্পনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকে। যদিও এ গ্রন্থ ধর্ম ও দর্শনকে স্পর্শ করে, প্রাথমিকভাবে তা বৈজ্ঞানিক বিবরণ দানে সীমিত থাকবে এবং যার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে, আংশিক পরীক্ষা করা হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই তৃতীয়াংশে। বিগ ব্যাংয়ের সত্যতা প্রমাণের প্রচেষ্টা হিসেবে নতুন অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির– যেমন হাবল স্পেস টেলিস্কোপ–যা উপগ্রহে স্থাপন করা হয়েছে– উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে আছি। হাবল স্পেস টেলিস্কোপের প্রাথমিক উপাত্ত আসা শুরু হয়েছে, সৃষ্টি-তত্ত্ব এক পরীক্ষাযোগ্য বিজ্ঞানের অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। আমরা শীঘ্রই জানতে পারব বিগ ব্যাং মানব উপলব্ধির ইতিহাসে আর এক তত্ত্ব।

পরিশেষে বইটি লেখার জন্য যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের জানাই খোশ-আমদেদ। 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'-এর স্নেহভাজন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে মুহাম্মদ সেলিম বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। এর প্রচ্ছদ, ইমেজ, ইলাস্ট্রেশন করে দিয়েছেন, জনাব দেলোয়ার হোসেন। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

মহাবিশ্ব সম্পর্কিত তথ্য পাঠকের নিকট উপভোগ্য হলে এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করলে আমার প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আলী
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা।
২০ মার্চ, ২০১৯ খ্রি.

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রাচীন অতিকথা /১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
মধ্যযুগে জ্যোতির্বিদ্যা /৪১

তৃতীয় অধ্যায়
আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা /৬৫

চতুর্থ অধ্যায়
জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্বসমূহ /১০১

পঞ্চম অধ্যায়
মহাবির্তক /১৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তা /২৪৩

সপ্তম অধ্যায়
বির্তকের অবসান /৩০৯

উপসংহার /৩৭৯

পরিশিষ্ট-১. শব্দকোষ /৪০৭
পরিশিষ্ট-২. চিত্র তালিকা /৪১৭
পরিশিষ্ট-৩. গ্রন্থপঞ্জী /৪২০
পরিশিষ্ট-৪. নির্ঘণ্ট /৪২১

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রাচীন অতিকথা

বিজ্ঞান খুব সহজভাবে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়, যা পূর্বে তারা জানত না। কিন্তু কবিতায় – এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

-পল ডিরাক

মহাবিশ্ব সম্পর্কে সবচেয়ে দুর্বোধ্য হল তা বোধগম্য।

-এলবার্ট আইনস্টাইন।

বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় অতিকথা থেকে এবং অতিকথার সমালোচনা করে।

-কার্ল পপার

আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য নই যে ঈশ্বর, যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়, বিচারবুদ্ধি এবং বোধশক্তি দিয়েছেন, তা ব্যবহার না করার উদ্দেশ্যে দিয়েছেন।

-গ্যালিলিও গ্যালিলি

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রাচীন অতিকথা

বিজ্ঞান খুব সহজভাবে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়, যা পূর্বে তারা জানত না। কিন্তু কবিতায় – এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

-পল ডিরাক

মহাবিশ্ব সম্পর্কে সবচেয়ে দুর্বোধ্য হল তা বোধগম্য।

-এলবার্ট আইনস্টাইন।

বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় অতিকথা থেকে এবং অতিকথার সমালোচনা করে।

-কার্ল পপার

আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য নই যে ঈশ্বর, যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়, বিচারবুদ্ধি এবং বোধশক্তি দিয়েছেন, তা ব্যবহার না করার উদ্দেশ্যে দিয়েছেন।

-গ্যালিলিও গ্যালিলি

ব্যবহার করে, তার নীল শরীরের টুকরাগুলি তাদের স্যুপের মসলারূপে যোগ করে। ক্রমান্বয়ে সে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যায় এবং সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে।

পশ্চিম আফ্রিকার ইওরুবা জনগোষ্ঠীর মতে ওলোরুণ আকাশের অধিপতি। তিনি পৃথিবীর প্রাণহীন জলাভূমির দিকে তাকালেন এবং এক দেবোপম সত্তাকে একটি শামুকের খোল নিয়ে আদি পৃথিবীতে নিয়ে যেতে বললেন। খোলে একটি কবুতর, একটি মুরগি ও কিছু মাটি ছিল। মাটি পৃথিবীর জলাভূমির ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হল, এবং কবুতর ও মুরগি মাটি আচড়াতে ও খুটাইতে থাকল যে পর্যন্ত না জলাভূমি শক্ত ভূমিতে পরিণত হয়। পরীক্ষা করার জন্য ওলোরুণ পৃথিবীতে গিরগিটি পাঠালেন, যা আকাশ থেকে নিচে নামতে নামতে নীল বর্ণ থেকে বাদামী বর্ণে পরিণত হল, এতে বুঝা গেল কবুতর ও মুরগি তাদের কাজ সফলভাবে শেষ করেছে।

প্রাচীন মিসরীয়রা মনে করতো আকাশ ধনুকাকৃতি এক ভগবতীর দেহ বিশেষ, আর ব্যাবিলনীয়রা মনে করতো আকাশ এক বেলজার বিশেষ। ভারতীয়দের মতে বিশ্ব এক প্রকাণ্ড হাতির দাঁতের ওপর অবস্থিত। চীনারা মনে করতো পৃথিবী একটি উল্টানো বাটি বিশেষ এবং আকাশ আর একটি সমকেন্দ্রিক বাটি বিশেষ যা পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে। গ্রীকদের মতে, সৃষ্টি-তত্ত্ববিদদের সংখ্যা দার্শনিকদের সংখ্যার সমান এবং তাদের সংখ্যা অনেক বেশি।

বিশ্বের প্রত্যেক সমাজ তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, চিন্তা-চেতনা এবং সংস্কার অনুযায়ী বিশ্ব সৃষ্টির অতিকথা বা কল্প-কথা উদ্ভাবন করেছে এবং সেভাবেই পৃথিবীর আকার প্রদান করা হয়েছে। এ কল্প-কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যা তাদের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার এবং মননের প্রতিফলন।

চীনের বৃহৎ ভগবান ফ্যান কু'র মৃতদেহ থেকেই হোক বা ইওরুবা সম্প্রদায়ের ওলোরুণ ভগবানের মুরগি ও কবুতর দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হোক, জনপ্রিয় এ কল্প-কাহিনীগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এ কল্প-কাহিনীগুলির মধ্যে বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় এক অতিকায় শক্তির ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়, যা প্রত্যেক সমাজ পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে। আর যারা এর ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে তাদেরকে অবিশ্বাসী এবং ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়।

প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ-বিজ্ঞানের সূতিকাগার

উপর্যুক্ত অতিকথায় বিশ্বাস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। এরপরে বোদ্ধাসমাজের চিন্তা-চেতনার প্রতি সাধারণ মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময়ে সর্বপ্রথম দার্শনিকগণ মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাসমূহ স্বচ্ছন্দে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ

গ্রীসের মিলেটাসের এনাক্সিমানডের (Anaximander, ৬১০-৫৪৬ খৃ-পূ.) যুক্তি উপস্থাপন করেন যে সূর্য পৃথিবীকে বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত এক অগ্নিগোলকের মধ্যের গর্তবিশেষ যা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। অনুরূপভাবে চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ মহাকাশে লুক্কায়িত আগুনের মধ্যে গর্তবিশেষ। অন্যদিকে কলোফোনের জেনোফেন্স (Zenophanes, ৫৬০-৪৭৮ খৃ-পূ.) মনে করেন পৃথিবী সারা রাতে যে দাহ্য গ্যাস পরিত্যাগ করে তা সঞ্চিত হয়ে এক চরম দহন-সঙ্কট মুহূর্তে (Critical mass) পৌঁছালে প্রজ্বলন শুরু হয়ে যায় এবং সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। সঞ্চিত গ্যাসপিণ্ডের দহন শেষ হলে আকাশে কিছু তারকারূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছাড়া অন্ধকার নেমে আসে এবং রাত হয়। অনুরূপভাবে আটাশ দিনের কাল-চক্রে গ্যাস সঞ্চয়ন ও দহনের ফলে চন্দ্রের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দেন তিনি।

বাস্তবিকপক্ষে, জেনোফেন্স এবং এনাক্সিমানডেরের মতবাদ সত্য না হলেও তা অতিপ্রাকৃত অথবা দেববৎ কৌশলের সাহায্যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যা পরিহার করে তত্ত্ব উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে। সূর্য এক গাগনিক অগ্নিকুণ্ড যা মহাবিশ্বের সুড়ঙ্গ পথে দেখা যায়, অথবা পৃথিবী নিঃসৃত গ্যাসের অগ্নিকুণ্ড যাই হোক, গুণগত দিক থেকে তা গ্রীক অতিকথা সূর্য এক অগ্নিবৎ গ্রীক দেবতা 'হেলিওস' রথে চড়ে আকাশের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তার প্রতিরূপ। এ কথা ঠিক নয় যে নূতন এ দার্শনিক সমাজ দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, বরং তাঁরা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ অবাঞ্ছিত দেবোপম শক্তির সাহায্যে ঘটেছে একথা অস্বীকার করেছে। দার্শনিকরাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সৃষ্টি-তত্ত্ববিদ, যারা প্রাকৃতিক মহাবিশ্বের এবং এর সূচনার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন শুরু করে। নিখিল বিশ্ব এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন যাকে গ্রীকরা জানার, নিরীক্ষণ করার এবং পরে পশ্চাতে কি কারণ আছে তা বুঝার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়ে।

জেনোফেন্স এবং এনাক্সিমানডের আধুনিক পরিভাষায় বৈজ্ঞানিক একথা বলা অত্যুক্তি করা হবে এবং তাদের চিন্তা-চেতনাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা অতি প্রশংসা করা হবে। তবে তাদের অবদান বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং তাদের তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ গ্রীক সৃষ্টি-তত্ত্ববিদদের চিন্তা-ভাবনা আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনার মত সমালোচনা করা যায়, তুলনা করা যায়, পরিমার্জনা এবং পরিত্যাগ করা যায়। গ্রীকরা ভাল যুক্তি বিশ্বাস করে, সুতরাং, দার্শনিক যুক্তিসমূহ পরীক্ষা করতে, এর পিছনে কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এবং সন্দেহাতীতভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পছন্দ করে। অন্যদিকে অন্যান্য সভ্যতার কোন ব্যক্তি তাদের অতিকথা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে সক্ষম ছিল না। প্রত্যেক অতিকথাই সে সমাজের অলঙ্ঘনীয় ধর্মবিধি বলে বিবেচিত হয়।

সামোসের পিথাগোরাস (Pithegorus, ৫৬৯-৪৭৫ খৃ-পূ.) এরূপ যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তার দর্শনের অংশ হিসেবে তিনি গণিতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেন এবং কিভাবে সংখ্যা ও সমীকরণ ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সূত্র উদ্ভাবন করা যায় তা ব্যাখ্যা করেন। পিথাগোরাস মনে করতেন সংখ্যা দ্বারা সবকিছু নির্ধারণ করা যায়। এ বিশ্বাস থেকে তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি নির্ধারণকল্পে গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে আকাশে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহের গতিবিধি এক নির্দিষ্ট পর্যায়কালে ঘটে যা তাদের গতিপথের দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, তিনি জ্যোতিষ্কসমূহের কক্ষপথ এবং পরিক্রমার সময়কালের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সংখ্যানুপাত বিরাজ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তার সময়ে এ তথ্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি এ তত্ত্ব বর্তমানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। এর একটি ভাল দিক হল পিথাগোরাস কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে বিশ্বাস করেননি। এছাড়াও তত্ত্বটি অত্যন্ত সহজ এবং পরিচ্ছন্ন। সাধারণত একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর সমীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব কয়েকটি বিশৃঙ্খল নীতি বিরোধী সমীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য। পদার্থবিদ বার্নড মেথিয়াস (Barndt Matthias) বলেন, 'কোন সূত্র ফিজিক্যাল রিভিউ-এর এক-চতুথাংশ পৃষ্ঠাজুড়ে বিস্তৃত হলে তা বর্জন কর, কারণ তা ভ্রান্ত। প্রকৃতি তত জটিল নয়।' একটি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে তখনই সক্ষম হবে যখন তা পর্যবেক্ষণ অথবা পরিমাপণযোগ্য হবে। যদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণজনিত ফলাফল পূর্বাভাসকৃত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলেই কেবল তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হবে। অপরদিকে একটি অশুদ্ধ তত্ত্ব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তা পরিত্যক্ত হবে অথবা উপযোগী করে নিতে হবে, যতই না সুন্দর ও সহজ হোক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতি বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলি (Thomas H. Huxely, ১৮২৫-১৮৯৫ খ্রি.) বলেন, 'বিজ্ঞানের দুঃখজনক ঘটনা হল, একটি সুন্দর প্রকল্প নীতিবিরোধী সত্য দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া।'

পিথাগোরাসের অনুসারী বোদ্ধাগণ তার ধারণা অবলম্বন করে তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন করে। ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান অধিকতর বাস্তবধর্মী এবং শক্তিশালী জ্ঞানের শাখায় পরিণত হয়, যা সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীর ব্যাস এবং তাদের পরস্পরের দূরত্ব নির্ধারণের মত আশ্চর্যজনক কাজ সম্পাদনে সহায়ক হয়। পরিমাপগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাইলফলক হিসাবে সমগ্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপে পরিণত হয়। এ পরিমাপগুলি বিশদ বিবরণ প্রদানের দাবী রাখে।

জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব ও আয়তন হিসাব করার পূর্বে প্রাচীন গ্রীকদের পৃথিবীর আকার গোলাকার এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। প্রাচীন গ্রীসে পৃথিবী গোলাকার এ মতবাদ এজন্য সৃষ্টি হয় যে গ্রীক দার্শনিকগণ দিগন্তে অন্তর্নিহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাহাজের পতাকাবাহী খুঁটি দেখতে পাওয়া যায়– এ ধারণার প্রতি সুপরিচিত ছিল। ইহা তখনই সম্ভব যদি সমুদ্রতল বক্রাকার হয়ে নিম্নগামী হয়। সমুদ্রতল বক্রাকার হলে পৃথিবীর উপরিভাগ বক্রাকার হবে এবং পৃথিবী গোলাকার হবে। চন্দ্রগ্রহণ দেখে এ মতবাদ আরও শক্তিশালী হয়, যখন পৃথিবী চন্দ্রের ওপর বৃত্তাকার ছায়া নিক্ষেপ করে, যা কেবল গোলাকার বস্তু থেকেই হতে পারে অনুমান করা যায়। চন্দ্র দেখতে বৃত্তাকার এ সত্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা গোলাকার পৃথিবীর ধারণা আরও শক্তিশালী করে। সবকিছুর ধারণা এভাবে উন্মোচিত হতে থাকে। ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক হেরোডোটুস (Herodotus, ৪৮৪-৪২৫ খৃ-পূ.) বলেন যে দূর উত্তরের লোকেরা ছয় মাস ঘুমায়। এ ধারণা অবাস্তব, কারণ মানুষ ছয় মাস ঘুমাতে পারে না। এ কথা বলে হেরোডোটুস বুঝাতে চেয়েছেন যে, দূর উত্তরে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয়। পৃথিবী গোলাকার হলেই কেবল পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন অংশ এর অক্ষাংশের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোকিত হবে, যা মেরু অঞ্চলে শৈত্য ও অর্ধবার্ষিক দিবারাত্রি সৃষ্টি করবে।

গোলাকার পৃথিবী আর এক প্রশ্নের জন্ম দেয়। দক্ষিণ গোলার্ধের লোকসকল নিম্নদিকে পড়ে যায় না কেন? (উল্লেখ্য তখনও আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়নি) এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রীকদের ব্যাখ্যা হল, তারা বিশ্বাস করে যে মহাবিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে এবং সবকিছুই এ কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর কেন্দ্র প্রকল্পিত মহাবিশ্বের কেন্দ্রের সাথে এক কেন্দ্রিক হয়ে যায়, (এ ধারণা সত্য নয় পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে) আর এজন্য পৃথিবী স্থির হয়ে যায় এবং এর উপরিভাগের সবকিছু একই কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং, গ্রীকরা অন্যান্য সকলের এবং সবকিছুর মত মাটিতে ধৃত হয়ে থাকে।

পৃথিবীর আকার পরিমাপের কৃতিত্ব অর্জন করেন ইরেটোসথিনিস (Eratosthenes, ২৭৬-১৯৫ খৃ-পূ.), যিনি খ্রিস্টপূর্ব ২৭৬ অব্দে আধুনিক কালের লিবিয়ার সাইয়িনে জন্মগ্রহণ করেন। ইরেটোসথিনিস বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধার পরিচয় দেন। খেলাধুলায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন বলে তাঁকে পেন্টাথলোন নামে আখ্যা দেওয়া হয়– অর্থাৎ যিনি পাঁচটি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তিনি 'পেন্টাথলোন।' ইরোটোসথিনিস তার জীবনের অধিকাংশ সময় আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন– যা প্রাচীন

জগতের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষায়তনের সম্মানজনক পদ। এ সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় শিক্ষায়তন গ্রীস থেকে কসমো্পলিটান আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং মহানগরীর লাইব্রেরি তখন পৃথিবীর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিতি পায়। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি তখন অত্যন্ত মেধাদীপ্ত ছাত্রদের অনুশীলন কেন্দ্র ছিল।

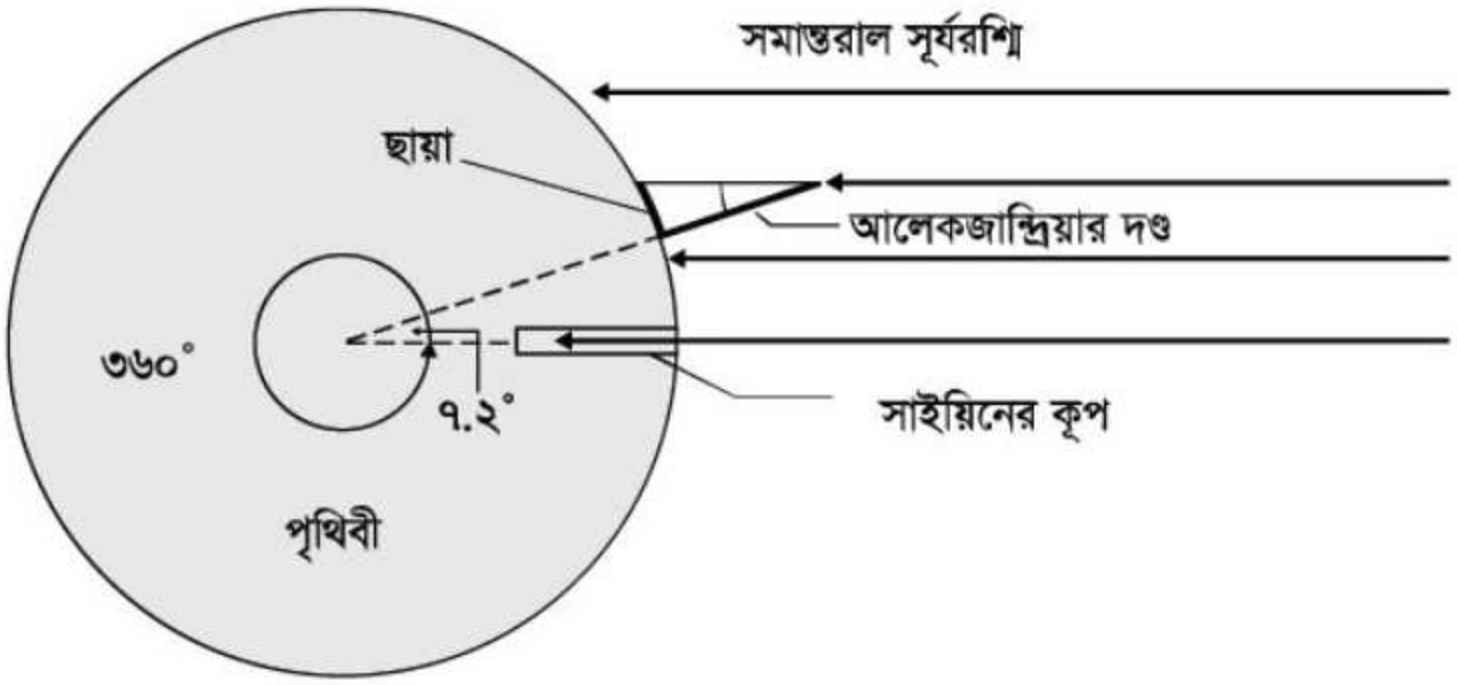

চিত্র-১. ইরেটোসথিনিসের পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের পরীক্ষা

ইরেটোসথিনিস আলেকজান্দ্রিয়ার দণ্ডের ছায়া দ্বারা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেন। এ পরীক্ষা কর্কটক্রান্তির দিনে পরিচালনা করা হয়, যখন সূর্য সর্বোত্তরে থাকে। কর্কটক্রান্তির রেখার নিম্নে শহরগুলি সূর্যের সন্নিকটে থাকে এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো পড়ে। (দূরত্বের স্কেল সঠিক নেওয়া হয়নি, কোণের মাপ সঠিক নাই)।

আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে কাজ করার সময়ে ইরোটোসথিনিস মিশরের দক্ষিণাংশে সাইয়িন শহরের নিকট (বর্তমান আসওয়ানের নিকটে) একটি অদ্ভুত কূপের সন্ধান পান। প্রতি বছর ২১ জুন উত্তর অয়নান্তের দিনে (সূর্য কর্কটক্রান্তির ওপরে) সূর্যের আলো খাড়াভাবে কূপের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সমগ্র কূপটি আলোকিত হয়। ইরেটোসথিনিস বুঝতে পারলেন সূর্য সেদিন সোজা কূপের ওপরে খাড়াভাবে অবস্থান করে। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় এরূপ হয় না। এখন আমরা জানি কর্কটক্রান্তি সাইয়িনের সোজা ওপরে, অর্থাৎ সূর্যের সর্বাপেক্ষা উত্তরগামী অক্ষাংশে সাইয়িন অবস্থিত। যেখানে সূর্য ২১ জুন খাড়াভাবে মাথার ওপরে আলো দেয়, ঠিক সেই জায়গায় অবস্থিত।

সাইয়িন ও আলেকজান্দ্রিয়ায় সূর্য একই সময়ে খাড়াভাবে আলোক বর্ষণ করে না এ ধারণা সামনে রেখে ইরেটোসথিনিস পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ে অগ্রসর হলেন। ২১ জুনে সূর্যের সমান্তরাল রশ্মিসমূহ মধ্যাহ্নে (চিত্র-১) যখন পৃথিবীর

ওপরে পতিত হয়, ঠিক সেই সময়ে সূর্যরশ্মি সাইয়িনে কূপের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছায়, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় তেমন হয় না। ইরেটোসথিনিস সাইয়িন ও আলেকজান্দ্রিয়ার মাটিতে লম্বভাবে দু'টি দণ্ড স্থাপন করলেন এবং দণ্ড ও রশ্মির মধ্যে কোণ পরিমাপ করলেন। প্রকৃতপক্ষে এ কোণের মান সাইয়িন এবং আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত ব্যাসার্ধ টানলে যে কোণ উৎপন্ন হয় তার সমান। তিনি কোণের মান নির্ণয় করেন ৭.২°।

এরপর যদি মনে করি একজন সাইয়িন থেকে সোজা আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করে না থেমে সোজা পৃথিবী গোলকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে পুনরায় সাইয়িনে এসে পৌঁছাল। তাহলে প্রকৃতপক্ষে লোকটি পৃথিবীর চতুর্দিক ঘুরে ৩৬০° প্রদক্ষিণ করল। যদি সাইয়িন ও আলেকজান্দ্রিয়ার কৌণিক দূরত্ব ৭.২° হয়, তাহলে লোকটি ৭.২°/ ৩৬০° বা পৃথিবীর পরিধির ১/৫০ অংশ পরিভ্রমণ করল। ইরেটোসথিনিস সাইয়িন ও আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব মাপলেন যা ৫০০০ স্টেড্‌স। যদি এ দূরত্ব পৃথিবীর পরিধির ১/৫০ হয়, তাহলে পৃথিবীর পরিধি হবে ২,৫০,০০০ স্টেড্‌স।

এক স্টেডের পরিমাপ কি? সাধারণত দৌড় প্রতিযোগিতার প্রমাণ দূরত্বকে এক স্টেড ধরা হয়। অলিম্পিক স্টেডের পরিমাণ ১৮৫ মিটার, তাহলে পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৮,২৫০ কিলোমিটার, যা বর্তমান প্রকৃত মাপ ৪,০১,১০০ কিলোমিটার থেকে ১৫% বেশি। তবে মিশরীয় স্টেডের মান ১৫৭ মিটার, সে হিসেবে পৃথিবীর পরিধির মাপ দাঁড়ায় ৩৯,২৫০ কিলোমিটার, যা শুদ্ধ মাপের ২%-এর মধ্যে।

ইরেটোসথিনিসের হিসাব শুদ্ধ মাপের ২% কম বা ১৫% বেশি একথা অবান্তর। গুরুত্বপূর্ণ হল ইরেটোসথিনিস বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। ভ্রমাত্মক মাপের কারণ হতে পারে পরীক্ষণীয়-ত্রুটি, যা কৌণিক মাপের ত্রুটি, অথবা উত্তরায়নের মধ্যাহ্নের সময়সূচির ত্রুটি এবং আরেকজান্দ্রিয়া প্রকৃত সাইয়িনের সোজা উত্তরে নয় এমন ত্রুটি। ইরেটোসথিনিসের আগে পৃথিবীর পরিধির মাপ কেউ জানতেন না, সুতরাং, পৃথিবীর পরিধির মাপ মোটামুটি ৪০,০০০ কিলোমিটার এক বিরাট অর্জন। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, একটি গ্রহের পরিধি, ব্যাস ইত্যাদি মাপের জন্য প্রয়োজন একটি দণ্ডসহ একজন মানব ও তাঁর মেধা। অন্য কথায়, একজন বুদ্ধিমানের কাছে কিছু যন্ত্রপাতি থাকলে প্রায় সবকিছু অর্জন করা যায়।

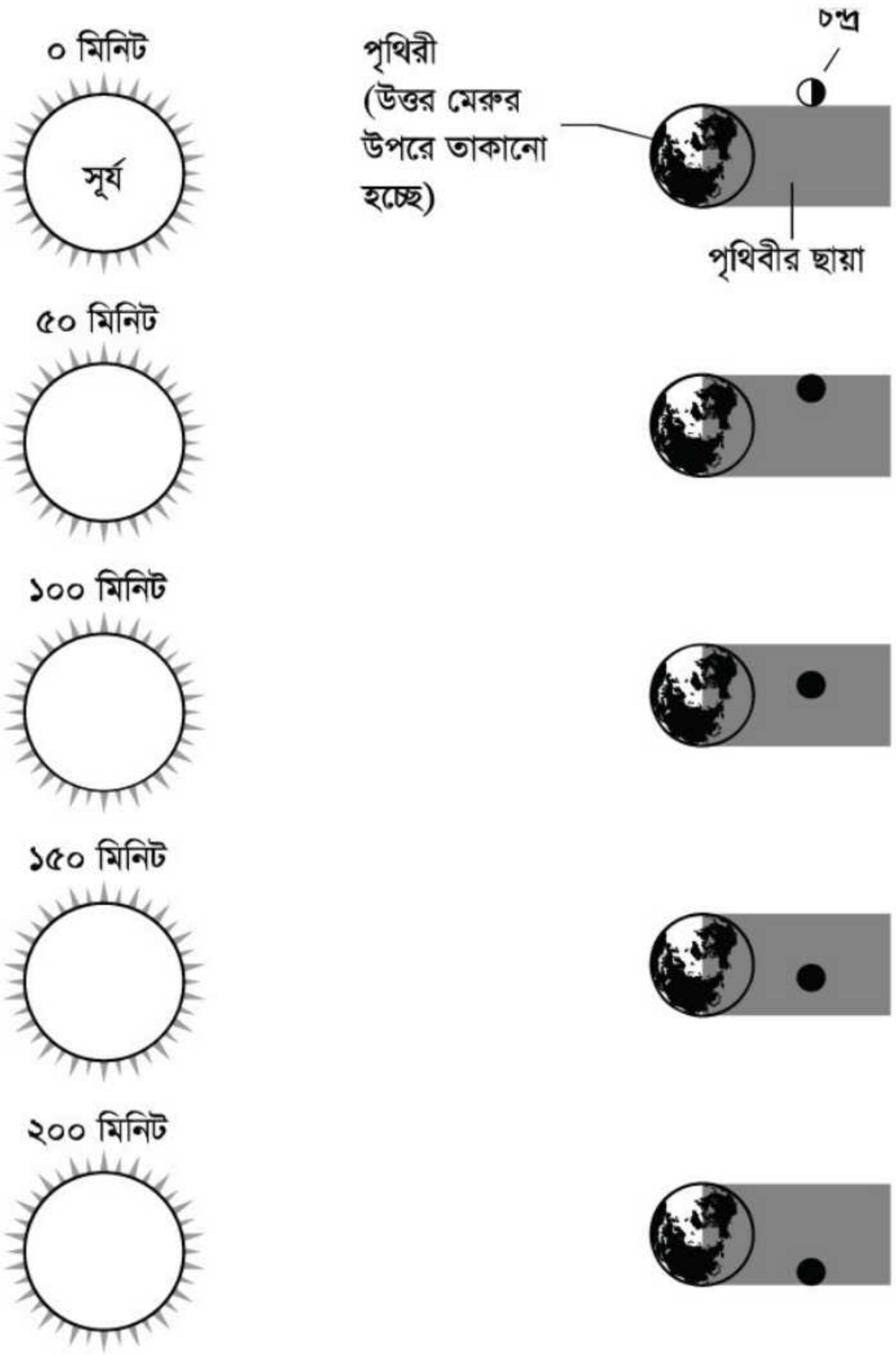

চিত্র-২. চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল

পৃথিবী ও চন্দ্রের আপেক্ষিক ব্যাস নির্ণয় করা যায় এক চন্দ্রগ্রহণের রাতে চন্দ্র পৃথিবীর ছায়া অতিক্রম করার সময় থেকে। পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য থেকে বহু দূরে, সুতরাং, পৃথিবীর ছায়ার বিস্তৃতি ও পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস সমান বলে ধরে নেওয়া যায়। চন্দ্র পৃথিবীর ছায়া স্পর্শ করা থেকে ছায়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সময়

পরিশিষ্ট-১

শব্দকোষ

অতি বেগুনি আলো (Ultra Violet Light, UV): ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক বিকিরণের যে উপাংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃষ্টিযোগ্য আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা সামান্য কম।

অদৃশ্য আলো (Dark Energy): এক প্রকার অনুমিত এনার্জি যা মহাবিশ্বের প্রসারণ ত্বরিত হচ্ছে এ পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে অদৃশ্য এনার্জি মহাবিশ্বের ভর-এনার্জি ব্যাখ্যায় প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এর প্রকৃতি সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়নি।

অণুতরঙ্গ বিকিরণ (Microwave Radiation): তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীর এক অংশ যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক সেন্টিমিটার। ইহাকে রেডিও-তরঙ্গের অংশ বলে মনে করা হয়।

অপেক্ষবাদ (Relativity): বিশেষ অপেক্ষবাদ ও সাধারণ অপেক্ষবাদ তত্ত্ব, যা আইনস্টাইন উদ্ভাবন ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অবলোহিত বর্ণালী (Infra-red Spectrum): তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীর এক বিশেষ অংশ যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃষ্টিযোগ্য বর্ণালীর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা দীর্ঘ।

অ্যানথ্রোপিক নীতি (Anthropic Principle): যে নীতি অনুযায়ী মনে করা হয় পদার্থবিদ্যার আইনসমূহ মানুষের অস্তিত্বের অনুকূল হবে। চূড়ান্তভাবে বলা যায়, অ্যানথ্রোপিক নীতি বলে যে মহাবিশ্ব জীবনধারণের জন্যই পরিকল্পিত হয়েছে।

আর্ক-মিনিট (Arc-Munite): অত্যন্ত সূক্ষ্মকোণ পরিমাপের জন্য একক, যা ১° ডিগ্রির ১/৬০ ভাগ।

আর্কসেকেন্ড (Arc-Second): অতি সূক্ষ্ম কোণ পরিমাপের জন্য একক, যা ১ আর্কমিনিটের ১/৬০ ভাগ, বা ১° ডিগ্রির ১/৩৬০০ ভাগ।

আদি পারমাণবিক তত্ত্ব (Primeval Atom Theory): জর্জেস লেমেত্রেঁর বিগ ব্যাং মডেলের প্রাথমিক রূপ, যেখানে বলা হয় মহাবিশ্বের সকল পরমাণু সূচনালগ্নে এক আদি পরমাণুতে সংহত ছিল।

আলফা-কণা (Alpha Particle): রেডিও-অ্যাকটিভ অবক্ষয়ের সময়ে যে অব পারমাণবিক কণিকা নিক্ষিপ্ত হয়। এ কণিকায় দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রোন থাকে এবং তা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের অনুরূপ।

সেফাইড পরিবর্তী নক্ষত্র (Cepheid Variable Star): এক প্রকার নক্ষত্র যার উজ্জ্বলতা এক বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত ১ থেকে ১০০ দিন ব্যবধানে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।হ্রাস-বৃদ্ধির সময়ের মাত্রা নক্ষত্রের গড় দীপ্তির সাথে সম্পর্কিত, যা নিরূপণ করা যায়। নক্ষত্রের দীপ্তি পৃথিবী থেকে দৃষ্ট বাহ্যিক দীপ্তির সাথে তুলনা করে তার দূরত্ব নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়। সুতরাং, এ নক্ষত্রগুলি বিশ্বনিখিলের দূরত্বের স্কেল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্থান-কাল (Space-Time): একীভূত নির্মাণ যার মধ্যে তিন মাত্রা স্থান (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) এবং চতুর্থ মাত্রা সময় অন্তর্ভুক্ত, মহাবিশ্বের অবয়ব নির্মাণের জন্য। স্থান-কালের ধারণা আইনস্টাইনের বিশেষ এবং সাধারণ অপেক্ষবাদ তত্ত্বের অখণ্ড অংশ। স্থান-কালের বক্রতার জন্য যে শক্তির উদ্ভব হয় তাকে আমরা অভিকর্ষ বলি।

হাইড্রোজেন (Hydrogen): মহাবিশ্বের অত্যন্ত সহজ, হালকা এবং প্রচুর মৌল, যার নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন থাকে এবং একটি ইলেক্ট্রন নিউক্লিয়াস পরিভ্রমণ করে।

হাবল-এর ধ্রুবক (Hubble's Constant): মহাবিশ্বের পরিমাপনীয় স্থিতিমাপ যা প্রসারণের বেগের বিবরণ দেয়। এর মান ৫০-১০০ কিলোমিটার/ সেকেন্ড/ মেগা পারসেক, যার অর্থ এক নক্ষত্রপুঞ্জ ১ মেগা-পারসেক দূরে অবস্থান করলে ৫০-১০০ কিলো মিটার/সেকেন্ড বেগে দূরে সরে যাবে। হাবল-এর সূত্র থেকে হাবল-এর ধ্রুবকের উৎপত্তি হয়েছে।

হাবল-এর সূত্র (Hubble's Law): গবেষণালব্ধ সূত্র যা, এক নক্ষত্রপুঞ্জের দূরে সরে যাওয়ার গতি তার দূরত্বের সাথে সমানুপাতি, $V=Ho \times d$ নির্ধারণ করে। এ সমীকরণের সমানুপাতি ধ্রুবক Ho হাবল-এর ধ্রুবক নামে পরিচিত।

হিলিয়াম (Helium): হাইড্রোজেনের পরে হিলিয়াম মহাবিশ্বের দ্বিতীয় অতি সাধারণ এবং দ্বিতীয় হালকা মৌল। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে চাপ ও তাপমাত্রা হিলিয়াম পরমাণুর ওপর শক্তি প্রয়োগ করে ভারী মৌল সৃষ্টি করতে সহায়তা করে।

***

পরিশিষ্ট-২

চিত্র তালিকা

চিত্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ইরেটোসথিনিসের পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের পরীক্ষা	২১
২	চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল	২৩
৩	চন্দ্রের ব্যাস নির্ণয়	২৪
৪	সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়	২৫
৫	সূর্যের ব্যাস নির্ণয়	২৬
৬	মহাবিশ্বের টলেমায়িক মডেল ও অনুমিত মডেল	৩১
৭	লম্বন	৩৪
৮	(ক) শুক্রের পশ্চাদ্গতি, (খ) শুক্রের লুপি কক্ষপথ	৩৬
৯	মহাবিশ্বের টলেমায়িক মডেল	৩৭
১০	প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানমন্দির	৪৬
১১	এস্ট্রোল্যাবের আরবীয় প্রতিকৃতি	৫২
১২	চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ	৫৪
১৩	উচ্চতা ও দিগন্ত নির্ণয়ের জন্য উলুগ বেগের যন্ত্র	৬০
১৪	আল-কাশির এস্ট্রোল্যাব	৬১
১৫	কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেল	৬৯
১৬	টাইকো ব্রাহের মহাবিশ্বের মডেল	৭৮
১৭	ইলিপসের চিত্রাঙ্কন	৮২
১৮	গ্রহ-গতির তারতম্য	৮৩
১৯	শুক্রের বিভিন্ন পর্যায়	৮৯
২০	ক) কোপারনিকাস, খ) টাইকো ব্রাহে, গ) কেপলার এবং ঘ) গ্যালিলিও	৯৪
২১	I_o-এর সরণ থেকে আলোর গতি নির্ণয়	১০৫
২২	মিকেলসনের সাতার প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত	১১০
২৩	এলবার্ট মিকেলসন	১১৩
২৪	আলোর প্রতিফলক ঘড়ি	১২২
২৫	আইনস্টাইন	১২৭
২৬	আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ দর্শন ব্যাখ্যা	১৩১
২৭	বুধের পাক খাওয়া কক্ষপথ	১৩৫
২৮	বৃহস্পতির তারকারশ্মি বিক্ষেপ	১৩৮
২৯	সূর্যের তারকারশ্মি বিক্ষেপ	১৩৯
৩০	সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে নক্ষত্ররশ্মির বিক্ষেপণ	১৪৬

চিত্র নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
৬৪	ফ্রিটস জুইকি	২৫৩
৬৫	মেরী কুরি ও পিয়ারে কুরি	২৬০
৬৬	পর্যায় সারণি	২৬২
৬৭	প্লুম-পুডিং মডেল	২৬৪
৬৮	জে. জে. থমসন ও আর্নেস্ট রাদারফোর্ড	২৬৫
৬৯	গেইগার মার্সডেন পরীক্ষা	২৬৬
৭০	রাদারফোর্ডের এটমিক মডেল	২৬৮
৭১	রাদারফোর্ডের পরীক্ষার ব্যাখ্যা	২৭০
৭২	রেডিয়ামের বিভাজন	২৭৩
৭৩	হিলিয়ামের গঠন	২৭৮
৭৪	জর্জ গেমো	২৮১
৭৫	সৃষ্টির দৈব রেখা	২৯২
৭৬	পদার্থের বিভিন্ন রূপ	২৯৪
৭৭	পুনসংযোজনের মুহূর্ত	২৯৬
৭৮	গেমো, এলফার, হেরম্যান ও আইলেম স্তূপ	২৯৮
৭৯	ফ্রেড হয়েল	৩০৩
৮০	চিরন্তন মডেল	৩০৪
৮১	গোল্ড, বন্ডি ও হয়েল	৩০৫
৮২	ওয়াল্টার বাদে	৩২৪
৮৩	হিলিয়াম কার্বন নিউক্লিয়-বিক্রিয়া	৩৩৩
৮৪	কার্বনের দুটি গঠন	৩৩৫
৮৫	কাল জেনস্কির এনটেনা	৩৪২
৮৬	ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রা	৩৪৪
৮৭	পেনজিয়াস ও উইলসন	৩৫৪
৮৮	সি.এম.বি বিকিরণের দুইটি গোলক	৩৬৭
৮৯	কোবী উপগ্রহ (ইনসেটে জর্জ স্মুট)	৩৬৯
৯০	কোবী গৃহিত মানচিত্র	৩৭২
৯১	ইন্ডিপেন্ডেন্ট (২৪ এপ্রিল, ১৯৯২)	৩৭৫
৯২	বদ্ধ, উন্মুক্ত এবং ফ্লাট মহাবিশ্ব	৩৮৬
৯৩	এলেন গুথ, ব্যাপ্তি-তত্ত্বের প্রণেতা	৩৮৭
৯৪	উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ এনিসোট্রোপী প্রোব	৩৯২
৯৫	WMAP প্রেরিত ছবি	৩৯৪

***

পরিশিষ্ট-৩
গ্রন্থপঞ্জী

Michael A. Seeds	*Foundations of Astronomy,* 8th Ed.Thomson Brooks/Cole.
Martin Rees Ed.	Universe, 2nd Ed. D.K. Publishers.
David Darling	*The Universal Book of Astronomy,* John Wiley and Sons, 2002.
Caren C. Fox	*The Big Bang Theory,* John Wiley and Sons, 2002.
Paul Fleisher	*The Big Bang,* Twenty First Century Books, 2006.
Joseph Silk	*The Big Bang,* 3rd Ed. A.W.H. Freeman Owl Book, Henry Holt and Co. N.Y. 2006.
Simon Singh	*Big Bang,* The Origin of the Universe, Harper Perennial, 2005.
Gerald L. Schroeder	*Genesis and the Big Bang,* Bantam Books, 1992.
R.A. Alpher, R. Herman	*Genesis and the Big Bang,* Oxford University Press, 2001.
Arthur Eddington	*The Expanding Universe,* Cambridge University Press, 1988.
Paul Davis	*The Last Three Minutes,* Basic Books, 1997.
Stephen Weinburg,	*The First Three Minutes,* Basic Books, 1994.
John Gribbin	*In Search of the Big Bang,* Penguin Books, 1998.
Waltar Isaacson,	*Einstein,* Simon & Schuster Paper Books, 2008.
Alan Guth	*The Inflationary Universe,* The Quest of a New Theory of Cosmic Origins, Reading, Mass Helix Books, 1997.
Board of Researchers	*Muslim Contribution to Science and Technology,* Islamic Foundation Bangladesh, 1996.
Salim T.S. Al-Hassani	*1001 Inventions: Muslim Heritage in Our World,* 2nd Ed. Foundation for Science, Technology and Civilisation.
Donald R. Hill	*Islamic Science and Engineering,* Edinburgh University Press, 1993.
Michael H. Morgan	*Lost History,* National Geography, 2008.
মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার,	*মুসলিম যুগে জ্যোতির্বিদ্যা,* ইসলামি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৯।
নাসরীন মুস্তাফা,	*জামসিদ গিয়াস উদ্দিন আল কাশি, জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান,* ইসলামি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

***